স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

পরাভক্তি

স্বামী বিবেকানন্দ

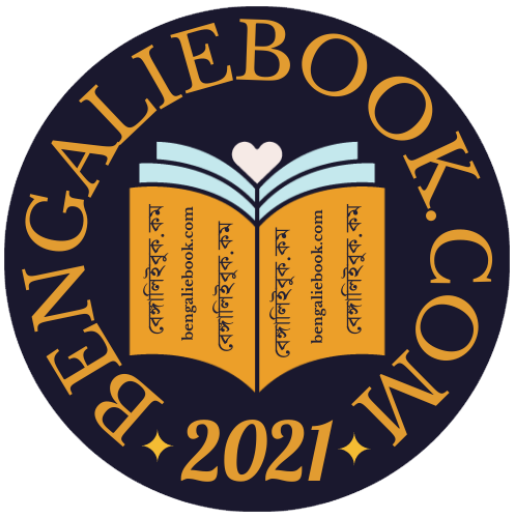

সূচিপত্র

১. ভক্তির প্রস্তুতি-ত্যাগ..... 2
২. ভক্তের বৈরাগ্য প্রেমপ্রসূত..... 5
৩. ভক্তিযোগের স্বাভাবিকতা ও উহার রহস্য 9
৪. ভক্তির প্রকাশভেদ 1 2
৫. বিশ্বপ্রেম ও আত্মসমর্পণ..... 1 4
৬. পরাবিদ্যা ও পরাভক্তি এক 1 9
৭. প্রেম ত্রিকোণাত্মক..... 2 1
৮. প্রেমের ভগবানের প্রমাণ তিনিই..... 2 6
৯. মানবীয় ভাষায় ভগবৎ-প্রেমের বর্ণনা 2 9
১০. উপসংহার..... 3 6

১. ভক্তির প্রস্তুতি-ত্যাগ

গৌণী ভক্তির কথা সংক্ষেপে শেষ করিয়া আমরা পরাভক্তির আলোচনায় প্রবেশ করিতেছি। এখন এই পরাভক্তি-অভ্যাসের জন্য প্রস্তুত হইবার শেষ সাধনটির কথা বিবেচনা করা যাক। সর্বপ্রকার সাধনের উদ্দেশ্য আত্মশুদ্ধি—নাম-সাধন, প্রতীক ও প্রতিমাদির উপাসনা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান কেবল আত্মশুদ্ধির জন্য। কিন্তু শুদ্ধিকারক সমুদয় সাধনের মধ্যে ত্যাগই সর্বশ্রেষ্ঠ—উহা ব্যতীত কেহ এই পরাভক্তির রাজ্যে প্রবেশই করিতে পারে না। অনেকের পক্ষে এই ত্যাগ অতি ভয়াবহ ব্যাপার বোধ হইতে পারে, কিন্তু ত্যাগ ব্যতীত কোনরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতিই সম্ভব নয়; সকল যোগেই এই ত্যাগ আবশ্যক। এই ত্যাগই ধর্মের সোপান—সমুদয় সাধনের অন্তরঙ্গ সাধন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে—ত্যাগই প্রকৃত ধর্ম। যখন মানবাত্মা সংসারের সমুদয় বস্তু দূরে ফেলিয়া গভীর তত্ত্বসমূহ অনুসন্ধান করে, যখন চৈতন্যস্বরূপ মানব বুঝিতে পারে, দেহরূপ জড়ে বদ্ধ হইয়া জড় হইয়া যাইতেছি এবং ক্রমশঃ বিনাশের পথে অগ্রসর হইতেছি, তখন সে জড়পদার্থ হইতে নিজের দৃষ্টি সরাইয়া লয়—তখনই ত্যাগ আরম্ভ হয়, তখনই প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি আরম্ভ হয়। কর্মযোগী সমুদয় কর্মফল ত্যাগ করেন, তিনি যে-সকল কর্ম করেন, তাহার ফলে তিনি আসক্ত হন না, তিনি ঐহিক বা পারত্রিক কোন লাভের জন্য আগ্রহান্বিত হন না। রাজযোগীর মতে সমুদয় প্রকৃতির লক্ষ্য—পুরুষ বা আত্মাকে বিচিত্র সুখদুঃখ ভোগ করানো। ইহার ফলে আত্মা বুঝিতে পারেন, প্রকৃতি হইতে তিনি নিত্য স্বতন্ত্র বা পৃথক্। মানবাত্মাকে জানিতে হইবে—তিনি চিরকাল চৈতন্যস্বরূপই ছিলেন, আর জড়ের সহিত তাঁহার সংযোগ কেবল সাময়িক, ক্ষণিকমাত্র। রাজযোগী প্রকৃতির সমুদয় সুখদুঃখ ভোগ করিয়া অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বৈরাগ্যের শিক্ষা লাভ করেন। জ্ঞানযোগীর বৈরাগ্য সর্বাপেক্ষা কঠোর। কারণ তাঁহাকে প্রথম হইতেই এই বাস্তবরূপে দৃশ্যমান প্রকৃতিকে মিথ্যা মায়া বলিয়া জানিতে হয়। তাঁহাকে বুঝিতে হয়, প্রকৃতিতে যত কিছু শক্তির প্রকাশ দেখিতেছি, সবই আত্মার শক্তি, প্রকৃতির নয়। তাঁহাকে প্রথম হইতেই জানিতে হয়, সর্বপ্রকার জ্ঞান—সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতা আত্মাতেই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে,

প্রকৃতিতে নাই। সুতরাং কেবল বিচারজনিত ধারণার বলে তাঁহাকে একেবারে সমুদয় প্রাকৃতিক বন্ধন ছিন্ন করিতে হয়। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সমুদয় পদার্থ ইন্দ্রজালের ন্যায় তাঁহার সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হয়, তিনি স্ব-মহিমায় বিরাজ করিতে চেষ্টা করেন।

সকল প্রকার বৈরাগ্য অপেক্ষা ভক্তিযোগীর বৈরাগ্য খুব স্বাভাবিক। ইহাতে কোন কঠোরতা নাই, জোর করিয়া কিছু ছাড়িতে হয় না। ভক্তের ত্যাগ অতি সহজ—চারিদিকের দৃশ্যের মতই অতি স্বাভাবিক; এই ত্যাগেরই প্রকাশ আমরা আমাদের চতুর্দিকে প্রতিদিন দেখিতে পাই—যদিও অল্প-বিস্তর বিকৃতরূপে। কোন পুরুষ কোন নারীকে ভালবাসিতে শুরু করিল; কিছুদিন বাদে সে আর একজনকে ভালবাসিল, প্রথমটিকে ছাড়িয়া দিল। ঐ প্রথম নারীটির চিন্তা ধীরে ধীরে শান্তভাবে তাহার মন হইতে চলিয়া গেল; সে আর ঐ নারীর অভাব বোধ করিল না। এবার মনে করো কোন নারী কোন পুরুষকে ভালবাসিতেছে। সে আবার যখন অপর এক পুরুষকে ভালবাসে, তখন এই প্রথম পুরুষটির কথা যেন তাহার মন হইতে সহজেই চলিয়া যায়। কোন লোক হয়তো নিজের শহরকে ভালবাসে। ক্রমশঃ সে নিজের দেশকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিল। তখন তাহার নিজের ক্ষুদ্র শহরের জন্য যে প্রগাঢ় ভালবাসা, তাহা স্বভাবতই চলিয়া গেল। আবার মনে কর, কোন লোক সমুদয় জগৎকে ভালবাসিতে শিখিল, তখন তাহার স্বদেশানুরাগ, নিজ দেশের জন্য প্রবল উন্মত্ত ভালবাসা চলিয়া যায়। তাহাতে তাহার কিছু কষ্ট হয় না। এই ভাব তাড়াইবার জন্য তাহাকে কিছু জোর করিতে হয় না। অশিক্ষিত লোক ইন্দ্রিয়সুখে উন্মত্ত, শিক্ষিত হইতে থাকিলে সে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় অধিকতর সুখ পাইতে থাকে। তখন সে বিষয়ভোগে আর তত সুখ পায় না। কুকুর ও ব্যাঘ্র খাদ্য পাইলে যেরূপ স্ফূর্তির সহিত ভোজন করিতে থাকে, কোন মানুষের পক্ষে সেরূপ সম্ভব নয়। আবার মানুষ বুদ্ধিবলে নানা বিষয় জানিয়া ও নানা কার্য সম্পাদন করিয়া সে সুখ অনুভব করে, কুকুর কখনও তাহা অনুভব করিতে পারে না। প্রথমে ইন্দ্রিয় হইতে সুখানুভূতি হইয়া থাকে, কিন্তু যখনই কোন প্রাণী জীবনের উচ্চস্তরে উন্নীত হয়, তখনই এই নিম্নজাতীয় সুখের মূল্য তাহার কাছে কমিয়া যায়। মনুষ্যসমাজে দেখা যায়, মানুষ যতই পশুর তুল্য হয়, সে ততই তীব্রভাবে ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব করে; আর যতই তাহার শিক্ষাদির উন্নতি হয়, ততই

বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনায় ও এরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ে তাহার সুখানুভূতি হইতে থাকে। এইরূপে মানুষ যখন বুদ্ধির বা মনোবৃত্তির অতীত ভূমিতে আরোহণ করে, যখন সে আধ্যাত্মিকতা ও দিব্যানুভূতির ভূমিতে আরোহণ করে, তখন সে এমন এক আনন্দের অবস্থা লাভ করে, যাহার তুলনায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি-পরিচালনাজনিত সুখ শূন্য বলিয়া মনে হয়। এরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যখন চন্দ্র উজ্জ্বলভাবে শোভা পায়, তখন তারাগণ নিষ্প্রভ হইয়া যায়। আবার সূর্য উদিত হইলে চন্দ্রও নিষ্প্রভ ভাব ধারণ করে। ভক্তির জন্য যে বৈরাগ্যের প্রয়োজন, তাহা কোন কিছুকে নষ্ট করিয়া পাইতে হয় না। যেমন কোন ক্রমবর্ধমান আলোকের নিকট অল্পোজ্জ্বল আলোক স্বভাবতই ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইতে হইতে শেষে একেবারে অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ ভগবৎপ্রেমোন্মত্ততায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি-জনিত সুখসমূহ স্বভাবতই নিষ্প্রভ হইয়া যায়।

এই ঈশ্বরপ্রেম ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া এমন এক ভাব ধারণ করে, যাহাকে ‘পরাভক্তি’ বলে। যে সাধক ঈশ্বরের জন্য ঐরূপ প্রেম লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অনুষ্ঠানের আর আবশ্যকতা থাকে না, শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন থাকে না; প্রতিমা, মন্দির, ভজনালয়, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়, দেশ, জাতি—এই-সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ভাব ও বন্ধন আপনা হইতেই চলিয়া যায়। কিছুই আর তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না, কিছুই তাঁহার স্বাধীনতা নষ্ট করিতে পারে না। জাহাজ হঠাৎ চুম্বকপ্রস্তরের পাহাড়ের নিকট আসিলে পেরেকগুলি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়া যায়, আর তক্তাগুলি জলের উপর ভাসিতে থাকে। ভগবৎকৃপা এইরূপে আত্মার বন্ধন অর্থাৎ তাহার স্বরূপ-প্রকাশের বিঘ্নসমূহ অপসারিত করিয়া দেয়, তখন উহা মুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং ভক্তিলাভের উপায়-স্বরূপ এই বৈরাগ্য-সাধনে কোন কঠোরতা নাই, কোন কর্কশ বা শুষ্ক ভাব নাই, কোনরূপ সংগ্রাম নাই। ভক্তকে তাঁহার হৃদয়ের কোন ভাবই দমন করিতে হয় না, চাপিয়া রাখিতে হয় না, তাঁহাকে বরং সেই-সকল ভাব প্রবল করিয়া ভগবানের দিকে চালিত করিতে হয়।

২. ভক্তের বৈরাগ্য প্রেমপ্রসূত

প্রকৃতিতে আমরা সর্বত্রই প্রেমের বিকাশ দেখিতে পাই। সমাজের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর ও মহৎ–সবই প্রেমপ্রসূত; আবার কুৎসিত এবং পৈশাচিক ব্যাপারগুলিও সেই একই প্রেমশক্তির বিকার মাত্র। যে চিত্তবৃত্তি হইতে পতিপত্নীর বিশুদ্ধ দাম্পত্যপ্রেম উদ্ভূত, অতি নীচ কামবৃত্তিও সেই খনি হইতে সঞ্জাত। ভাব সেই একই, তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উহার প্রকাশ বিভিন্ন। এই একই প্রেম কাহাকেও ভাল কাজে প্রেরণা দেয় এবং সে দরিদ্রকে সর্বস্ব অর্পণ করে আবার কেহ বা ইহারই প্রভাবে নিজ ভ্রাতার গলা কাটিয়া তাহার যথাসর্বস্ব অপহরণ করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজেকে যেমন ভালবাসে, প্রথম ব্যক্তি অপরকে সেইরূপ ভালবাসে। দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রেম ভ্রান্ত পথে চালিত; কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে উহা ঠিক পথে প্রযুক্ত। যে-অগ্নিতে আমাদের খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাই আবার একটি শিশুকে দগ্ধ করিতে পারে। ইহাতে অগ্নির কিছু দোষ নাই, ব্যবহারে ও ফলে তারতম্য হয়। অতএব যে-প্রেমকে দুই ব্যক্তির প্রবল আসঙ্গস্পৃহা বলা যায়, তাহাই আবার অবশেষে উচ্চনীচ সর্বপ্রাণীর সেই এক স্বরূপে বিলীন হইবার ইচ্ছারূপে সর্বত্র প্রকাশিত।

ভক্তিযোগ প্রেমের এই উচ্চতম বিকাশের বিজ্ঞানস্বরূপ। উহা আমাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার, প্রেমকে যথার্থ পথে পরিচালনা করিবার, উহাকে একটি নূতন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার এবং উহা হইতে শ্রেষ্ঠ ফল–আধ্যাত্মিক শান্তি ও আনন্দ লাভ করিবার উপায় প্রদর্শন করে। ভক্তিযোগ বলে না–ত্যাগ কর বা ছাড়িয়া দাও; শুধু বলে–ভালবাসো, সেই উচ্চতম আদর্শকে ভালবাসো। যাহার প্রেমের আস্পদ ঐরূপ, সর্বপ্রকার নীচভাব স্বভাবতই তাহার মন হইতে অন্তর্হিত হইবে।

‘তোমার সম্বন্ধে আমি আর কিছু বলিতে পারি না, শুধু বলিতে পারিঃ তুমি আমার প্রেমাস্পদ। তুমি সুন্দর, আহা! অতি সুন্দর, তুমি স্বয়ং সৌন্দর্যস্বরূপ!’–হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে ভক্তেরা চিরকাল এইরূপ বলেন। ভক্তিযোগে আমাদের শুধু এইটুকু করিতে হইবে–সুন্দরের প্রতি আমাদের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহা ভগবানের দিকে চালিত করিতে

হইবে। প্রাণের সহিত ভালবাস। মানুষের মুখে, আকাশে, তারায় অথবা চন্দ্রে যে সৌন্দর্যের বিকাশ দেখা যায়, তাহা কোথা হইতে আসিল? উহা সেই ভগবানের সর্বব্যাপী সৌন্দর্যের আংশিক প্রকাশ মাত্র। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, 'তাঁহারই প্রকাশে সকলের প্রকাশ।'১ ভক্তির এই উচ্চভূমিতে দণ্ডায়মান হও। উহা একেবারে তোমাদের ক্ষুদ্র আমিত্ব ভুলাইয়া দিবে। জগতের ক্ষুদ্র স্বার্থপর আসক্তিসমূহ ত্যাগ কর। কেবল মানুষকেই তোমার সাধারণ বা তদপেক্ষা উচ্চতর কার্যপ্রবৃত্তির একমাত্র লক্ষ্য মনে করিও না। সাক্ষিরূপে অবস্থিত হইয়া প্রকৃতির সমুদয় ব্যাপার পর্যবেক্ষণ কর। মানুষের প্রতি আসক্তিশূন্য হও। দেখ, জগতে এই প্রবল প্রেমের ভাব কিরূপে কার্য করিতেছে। কখনও কখনও হয়তো একটা ধাক্কা আসিল; উহাও সেই পরমপ্রেমলাভের চেষ্টার আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। হয়তো কোথাও একটু দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ ঘটিল, হয়তো কাহারও পদস্খলন হইল—এ-সবই সেই প্রকৃত উচ্চতর প্রেমে আরোহণ করিবার সোপানমাত্র। সাক্ষিস্বরূপ একটু দূরে দাঁড়াইয়া দেখ, কিভাবে এই দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ মানুষকে প্রকৃত প্রেমের পথে আগাইয়া দেয়। যখন কেহ এই সংসার-প্রবাহের মধ্যে থাকে, তখন সে ঐ সংঘর্ষগুলি অনুভব করে। কিন্তু যখনই উহার বাহিরে আসিয়া কেবল সাক্ষিরূপে পর্যবেক্ষণ করিবে, তখন দেখিবে—অনন্ত প্রণালীর মধ্য দিয়া ভগবান্ নিজেকে প্রেমরূপে প্রকাশিত করিতেছেন।

'যেখানেই একটু আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে সেই অনন্ত আনন্দস্বরূপ স্বয়ং ভগবানের অংশ রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে।'২ অতি নিম্নভাবের আসক্তিতেও ভগবৎপ্রেমের বীজ অন্তর্নিহিত আছে। সংস্কৃত ভাষায় ভগবানের একটি নাম 'হরি'। ইহার অর্থ এই—তিনি সকলকেই নিজের কাছে আ-হরণ করিতেছেন বা আকর্ষণ করিতেছেন। বাস্তবিক তিনিই আমাদের ভালবাসার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। এই যে আমরা নানাদিকে আকৃষ্ট হইতেছি, কিন্তু আমাদিগকে টানিতেছে কে? তিনিই আমাদিগকে তাহার দিকে ক্রমাগত টানিতেছেন। প্রাণহীন জড়—সে কি কখনও চৈতন্যবান্ আত্মাকে টানিতে পারে? কখনই পারে না, কখনও পারিবেও না। একখানি সুন্দর মুখ দেখিয়া একজন উন্মত্ত হইল। গোটাকতক জড় পরমাণু কি তাহাকে পাগল করিল? কখনই নয়। ঐ জড়-পরমাণুসমূহের অন্তরালে নিশ্চয়ই ঐশ্বরিক শক্তি ও ঐশ্বরিক প্রেমের লীলা বিদ্যমান। অজ্ঞ লোকে উহা

জানে না, তথাপি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে উহা দ্বারাই—কেবল উহা দ্বারাই আকৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং দেখা গেল, অতি নিম্নতম আসক্তিও ঈশ্বর হইতে শক্তি সংগ্রহ করে।—'হে প্রিয়তমে, পতির জন্য কেহ পতিকে ভালবাসে না, আত্মার জন্যই পত্নী পতিকে ভালবাসে।' প্রেমিকা পত্নীগণ ইহা জানিতে পারে, না জানিতেও পারে, তথাপি তত্ত্বটি সত্য। 'হে প্রিয়তমে, পত্নীর জন্য পত্নীকে কেহ ভালবাসে না, আত্মার জন্যই পত্নী প্রিয়া হয়।'৩

এইরূপ কেহই নিজের সন্তানকে অথবা আর কাহাকেও তাহাদেরই জন্য ভালবাসে না, আত্মার জন্যই ভালবাসিয়া থাকে। ভগবান্ যেন একটি বৃহৎ চুম্বক-প্রস্তর, আমরা যেন লৌহচূর্ণের ন্যায়। আমরা সকলেই সদাসর্বদা তাঁহার দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছি। আমরা সকলেই তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। জগতে এই যে নানাবিধ চেষ্টা—এই-সকলের একমাত্র লক্ষ্য কেবল স্বার্থ হইতে পারে না। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ জানে না, তাহারা কি করিতেছে। বাস্তবিক তাহারা জীবনের সকল চেষ্টার মধ্য দিয়া ক্রমাগত সেই পরমাত্মা-রূপ বৃহৎ চুম্বকের নিকটবর্তী হইতেছে। আমাদের এই কঠোর জীবন-সংগ্রামের লক্ষ্য—তাঁহার নিকট যাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার সহিত একীভূত হওয়া।

ভক্তিযোগীই এই জীবন-সংগ্রামের অর্থ জানেন ও উহার উদ্দেশ্য বুঝেন, তিনি এই সংগ্রাম অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন; সুতরাং তিনি জানেন, উহার লক্ষ্য কি, এই জন্য তিনি সর্বান্তঃকরণে এগুলি হইতে মুক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন। এ-সকল এড়াইয়া তিনি সকল আকর্ষণের মূলকারণ হরির নিকট একেবারে যাইতে চান। ইহাই ভক্তের ত্যাগ—ভগবানের প্রতি এই প্রবল আকর্ষণ তাঁহার আর সকল আসক্তিকে নাশ করিয়া দেয়। এই অনন্ত প্রেম তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করে, অন্যান্য আসক্তির সেখানে স্থান হয় না। ইহা ছাড়া আর কি হইতে পারে? ঈশ্বর-রূপ প্রেমসমুদ্রের জলে ভক্তি তখন ভক্তের হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। সেখানে ছোটখাটো ভালবাসার স্থান আর নেই। ইহাই ভক্তের ত্যাগ বা বৈরাগ্য। তাৎপর্য এইঃ ভগবান্ ভিন্ন সমুদয় বিষয়ে ভক্তের যে বৈরাগ্য, তাহা ভগবানের প্রতি পরম অনুরাগ হইতে উৎপন্ন।

পরাভক্তি-লাভের জন্য এইভাবে প্রস্তুত হওয়াই আবশ্যক। এই বৈরাগ্য-লাভ হইলে পরাভক্তির উচ্চতম শিখরে উঠিবার দ্বার যেন খুলিয়া যায়। তখনই আমরা বুঝিতে আরম্ভ করি, পরাভক্তি কি। আর যিনি পরাভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, একমাত্র তাঁহারই বলিবার অধিকার আছে, ধর্মানুভূতির জন্য তাঁহার পক্ষে প্রতিমাপূজা বা অনুষ্ঠানাদি নিষ্প্রয়োজন। তিনিই কেবল সেই পরম প্রেমাবস্থা লাভ করিয়াছেন, যেখানে সকল মানবের ভ্রাতৃত্ব অনুভব করা সম্ভব; অপরে কেবল ইহা লইয়া বৃথা বাক্যব্যয় করে। তিনি তখন আর কোন ভেদ দেখিতে পান না; মহান্ প্রেমসমুদ্র তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে; তখন তিনি আমাদের মত মানুষ পশু তরু লতা সূর্য চন্দ্র তারা দেখেন না, তিনি সর্বত্র সব কিছুর মধ্যে তাঁহার প্রিয়তমকে দেখিতে পান। যাহার মুখের দিকে তিনি তাকান, তাহারই ভিতর তিনি হরির প্রকাশ দেখিতে পান। সূর্য বা চন্দ্রের আলোক তাঁহারই প্রকাশমাত্র। যেখানেই তিনি কোন সৌন্দর্য বা মহত্ত্ব দেখিতে পান, সেখানেই তিনি অনুভব করেন—সবই সেই ভগবানের। এরূপ ভক্ত জগতে এখনও আছেন, জগৎ কখনই এরূপ ভক্ত-বিরহিত হয় না। এরূপ ভক্ত সর্পদষ্ট হইলে বলে—আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে দূত আসিয়াছিল। এইরূপ ব্যক্তিরই কেবল বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার আছে। তাঁহার হৃদয়ে কখনও ক্রোধ বা ক্ষোভের সঞ্চার হয় না। বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ তাঁহার নিকট হইতে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত। যখন প্রেমবলে অতীন্দ্রিয় সত্যকে তিনি সর্বদা দেখিতে পান, তখন কি করিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইবেন?

৩. ভক্তিযোগের স্বাভাবিকতা ও উহার রহস্য

অর্জুন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ‘যাঁহারা সর্বদা অবহিত হইয়া তোমার উপাসনা করেন, আর যাঁহারা অব্যক্ত নির্গুণের উপাসক, এতদুভয়ের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী?’ শ্রীভগবান্ বলেন, ‘যাঁহারা আমাতে মন সংলগ্ন করিয়া নিত্যযুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার শ্রেষ্ঠ উপাসক, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী। যাঁহারা ইন্দ্রিয়সংযম ও বিষয়ে সমবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া নির্গুণ, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, নির্বিকার, অচল নিত্যস্বরূপকে উপাসনা করেন, সেই সর্বভূতহিতে রত ব্যক্তিগণও আমাকে লাভ করেন। কিন্তু যাঁহাদের মন অব্যক্তে আসক্ত, তাঁহাদের অধিকতর কষ্ট হইয়া থাকে; কারণ দেহাভিমানী ব্যক্তি অতি কষ্টে এই নির্গুণ ব্রহ্মে নিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা সমুদয় কার্য আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া আমার ধ্যান ও উপাসনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে শীঘ্রই পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুরূপ মহাসমুদ্র হইতে উদ্ধার করি, কারণ তাঁহাদের মন সর্বদাই আমার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আসক্ত।’৪এখানে জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ উভয়কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এমন কি, উদ্ধৃতাংশে উভয়েরই লক্ষণ প্রকাশ করা হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। জ্ঞানযোগ অবশ্য অতি মহান্; উহা তত্ত্ববিচারের দ্বারা পরব্রহ্মকে অনুভব করিবার পথ। আর আশ্চর্যের বিষয়, প্রত্যেকেই ভাবে—তত্ত্ববিচারের দ্বারা সে সব কিছু করিতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞানযোগ অনুসারে জীবন-যাপন বড় কঠিন ব্যাপার, উহাতে অনেক বিপদাশঙ্কা আছে।

জগতে দুই প্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়। একদল আসুর-প্রকৃতি—তাহারা এই শরীরটাকে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে রাখাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য মনে করে। আর যাঁহারা দেবপ্রকৃতি, তাঁহারা এই শরীরকে কেবল কোন বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় মনে

করেন। তাঁহারা মনে করেন, উহা যেন আত্মার উন্নতিসাধনের যন্ত্রবিশেষ। কথিত আছে, শয়তান নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য উদ্ধৃত করিতে পারে, করিয়াও থাকে। সুতরাং জ্ঞানমার্গ যেমন সাধুব্যক্তির উচ্চতম আদর্শলাভের প্রবল উৎসাহদাতা, সেইরূপ অসাধু ব্যক্তিরও কার্যের সমর্থক বলিয়া মনে হয়। জ্ঞানযোগে ইহাই মহা বিপদাশঙ্কা। কিন্তু ভক্তিযোগ অতি স্বাভাবিক ও মধুর। ভক্ত জ্ঞানযোগীর মত অত উচ্চ স্তরে উঠেন না, সুতরাং তাঁহার গভীর পতনের আশঙ্কাও নাই। এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, সাধক যে পথেই অবলম্বন করুন না কেন, যতদিন না সমুদয় বন্ধন মোচন হইতেছে, ততদিন তিনি কখনই মুক্ত হইতে পারেন না। প্রশ্ন করা যাইতে পারে, ভক্ত এই সহজ পথ বাছিয়া লইয়া কিভাবে মুক্তিলাভ করিবেন?

এই কয়েকটি শ্লোকে দেখা যায়, প্রগাঢ় ভক্তি দ্বারা কিরূপে জনৈকা ভাগ্যবতী গোপীর জীবাত্মার পাপপুণ্যরূপ বন্ধন চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ‘ভগবানের চিন্তাজনিত পরমাহ্লাদে তাঁহার সমুদয় পুণ্যকর্মজনিত বন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইল, আর ভগবানকে কাছে না পাওয়ার মহাদুঃখে তাঁহার সমুদয় পাপ ধৌত হইয়া গেল। তখন কোন বন্ধন না থাকায় সেই গোপকন্যা মুক্তিলাভ করিলেন।’৫ এই শাস্ত্রবাক্য হইতে বেশ বুঝা যায়, ভক্তিযোগের গুহ্য রহস্য এই যে, মনুষ্যহৃদয়ের যত প্রকার বাসনা বা ভাব আছে, উহার কোনটিই স্বরূপতঃ মন্দ নয়; উহাদিগকে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ক্রমশঃ উচ্চাভিমুখী করিতে হইবে—যতদিন না ঐ ভাবগুলি চরমোৎকর্ষ লাভ করে। উহাদের সর্বোচ্চ গতি ভগবান্, এবং অন্যান্য সকল গতিই নিম্নাভিমুখী। ফল অনুসারে আমাদের সমুদয় মনোভাবকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—সুখ ও দুঃখ; শেষোক্ত মনোভাবকে কি করিয়া উচ্চাভিমুখী করা যায়, তাহা ভাবিয়া সাধক দিশেহারা হন। কিন্তু ভক্তিযোগ শিক্ষা দেয়—ইহা সত্য-সত্যই সম্ভব। দুঃখের প্রয়োজনীয়তা আছে। বিষয় বা ধন লাভ করিতে না পারিয়া যখন কেহ দুঃখ পায়, তখন দুঃখবৃত্তিকে ভুল পথে চালিত করা হইতেছে। ‘কেন আমি সেই পরম পুরুষকে লাভ করতে পারিলাম না? কেন আমি ভগবানকে পাইলাম না?’—এই বলিয়া যদি কেহ যন্ত্রণায় অস্থির হয়, তবে সেই যন্ত্রণা তাহার মুক্তির কারণ হইবে। কয়েকটি মুদ্রা পাইলে যখন তোমার আহ্লাদ হয়, তখন বুঝিতে হইবে, তুমি তোমার আহ্লাদ-বৃত্তিকে ভুল

পথে চালাইতেছ। উহাকে উচ্চতর বিষয়ে প্রেরণ করিতে হইবে, আমাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ভগবানের চিন্তায় আনন্দ বোধ করিতে হইবে। অন্যান্য ভাব সম্বন্ধেও এই একই কথা। ভক্ত বলেন, উহাদের কোনটিই মন্দ নয়; সুতরাং তিনি ঐ ভাবগুলি বশীভূত করিয়া নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরাভিমুখী করেন।

৪. ভক্তির প্রকাশভেদ

ভগবানে ভক্তি যতভাবে প্রকাশিত হয়, এখানে তাহার কয়েকটি আলোচিত হইতেছে।৬ প্রথম—'শ্রদ্ধা'। লোকে মন্দির ও তীর্থস্থানসমূহের প্রতি এত শ্রদ্ধাসম্পন্ন কেন? এই-সকল স্থানে ঈশ্বরের পূজা হয় বলিয়া, এই-সকল স্থানে গেলে ঈশ্বরের ভাবের উদ্দীপনা হয় বলিয়া, এই-সকল স্থানের সহিত ঈশ্বরের সত্তা জড়িত। সকল দেশেই লোকে ধর্মাচার্যগণের প্রতি এত শ্রদ্ধাসম্পন্ন কেন? তাঁহারা সকলেই সেই এক ভগবানের মহিমাই প্রচার করেন; তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। এই শ্রদ্ধার মূল ভালবাসা। যাহাকে আমরা ভালবাসি না, তাহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে পারি না।

তারপর 'প্রীতি'—ভগবচ্চিন্তায় সুখ বা আনন্দ অনুভব। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে মানুষ কি তীব্র আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে! ইন্দ্রিয়সুখকর দ্রব্য লাভ করিতে মানুষ সর্বত্র ছুটিয়া যায়, মহা বিপদেরও সম্মুখীন হয়। ভক্তের চাই ঠিক এই প্রকার ভালবাসা। ভগবানের দিকে এই ভালবাসার মোড় ফিরাইতে হইবে।

তারপর মধুরতম যন্ত্রণা 'বিরহ'—প্রেমাস্পদের অভাবজনিত মহাদুঃখ। এই দুঃখ জগতে সকল দুঃখের মধ্যে মধুর—অতি মধুর। 'ভগবানকে লাভ করিতে পারিলাম না, জীবনে একমাত্র প্রাপ্তব্য বস্তু পাইলাম না' বলিয়া মানুষ যখন অতিশয় ব্যাকুল হয় এবং সেজন্য যন্ত্রণায় অস্থির ও উন্মত্ত হইয়া উঠে, তখনই বুঝিতে হইবে ভক্তের বিরহ-অবস্থা। মনের এই অবস্থা হইলে প্রেমাস্পদ ব্যতীত আর কিছু ভাল লাগে না (ইতর-বিচিকিৎসা)। পার্থিব প্রেমেও মাঝে মাঝে উন্মত্ত প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে এই বিরহ দেখা যায়। নর-নারীর পরস্পর-মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় হইলে তাহারা যাহাদিগকে ভালবাসে না, তাহাদের সান্নিধ্যে স্বভাবতই একটু বিরক্তি বোধ করে। এইরূপে যখন পরাভক্তি হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, তখন যে বস্তু বিষয় বা ব্যক্তি সাধক ভালবাসেন না, সেগুলি সহ্য করিতে পারেন না। তখন ভগবান্ ব্যতীত অন্য বিষয়ে কথা বলাও ভক্তের পক্ষে বিরক্তিকর হইয়া পড়ে। 'তাঁহার বিষয়ে, কেবল তাঁহার বিষয়ে চিন্তা কর, অন্য সকল কথা ত্যাগ কর।'৭

যাঁহারা শুধু ঈশ্বর সম্বন্ধে কথা বলেন, ভক্ত তাহাদিগকেই বন্ধু বলিয়া মনে করেন; কিন্তু যাঁহারা অন্য বিষয়ে কথা বলেন, তাঁহাদিগকে শত্রু বলিয়া মনে হয়।

আরও এক উচ্চ অবস্থা আসে, যখন এই জীবনধারণও শুধু প্রেমাস্পদের জন্য। উহা ব্যতীত এক মুহূর্তের জন্যও জীবনধারণ করা ভক্তের পক্ষে অসম্ভব বোধ হয়। এই অবস্থার শাস্ত্রীয় নাম 'তদর্থপ্রাণস্থান'। আর সেই প্রিয়তমের চিন্তা হৃদয়ে বর্তমান থাকে বলিয়াই এই জীবনধারণে সুখবোধ হয়। সংক্ষেপে—প্রিয়তমের চিন্তা আছে বলিয়াই জীবন তখন মধুর বলিয়া মনে হয়।

তদীয়তা—তাঁহার হইয়া যাওয়া; ভক্তিমতে সাধক যখন সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন এই 'তদীয়তা' আসে। যখন তিনি ভগবানের পাদ স্পর্শ করিয়া ধন্য হন, তখন তাঁহার প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়, বিশুদ্ধ হইয়া যায়; তখন তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়া যায়। তথাপি অনেক ভক্ত কেবল ঈশ্বরের উপাসনার জন্যই জীবনধারণ করেন। এই জীবনে ইহাই তাঁহাদের একমাত্র সুখ—এটি তাঁহারা ছাড়িতে চান না।'হে রাজন্, হরির এতাদৃশ মনোহর গুণরাশি যে, যাঁহারা আত্মায় পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, তাঁহারাও ভগবানকে নিষ্কামভাবে ভক্তি করিয়া থাকেন।'৮ 'এই ভগবানকে দেবগণ, মুমুক্ষু ও ব্রহ্মবাদীরাও উপাসনা করিয়া থাকেন।'৯ যখন মানুষ নিজেকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে তখনই এই 'তদীয়তা'-অবস্থা লাভ হয়। সাধারণ ভালবাসাতেও যেমন প্রেমাস্পদের সকল জিনিষই প্রেমিকের চক্ষে অমূল্য বলিয়া বোধ হয়, তেমনি ভক্তের নিকট সকলই পবিত্র বলিয়া বোধ হয়, কারণ সবই যে তাঁহার প্রেমাস্পদের। প্রিয়তমের এক টুকরা বস্ত্রও সে ভালবাসে; এরূপে যে ভগবানকে ভালবাসে, সে সমুদয় জগৎকেও ভালবাসে; কারণ সমুদয় জগৎই যে তাঁহার।

৫. বিশ্বপ্রেম ও আত্মসমর্পণ

প্রথমে সমষ্টিকে ভালবাসিতে না শিখিলে কিরূপে ব্যষ্টিকে ভালবাসা যায়? ঈশ্বরই সমষ্টি। সমগ্র জগৎকে যদি এক অখণ্ডস্বরূপে চিন্তা করা যায়, তাহাই ঈশ্বর; আর দৃশ্যমান জগৎ যখন পৃথক্ পৃথক্ রূপে দেখা যায়, তখনই উহা ব্যষ্টি। সমষ্টিকে, সেই সর্ব-ব্যাপীকে–যে এক অখণ্ড বস্তুর ভাবের মধ্যে ক্ষুদ্রতর অখণ্ড ভাবসমূহ (unities) অবস্থিত, তাঁহাকে ভালবাসিলেই সমগ্র জগৎকে ভালবাসা সম্ভব। ভারতীয় দার্শনিকগণ 'বিশেষ' (particular) লইয়াই ক্ষান্ত নন, তাঁহারা ব্যষ্টির দিকে ক্ষিপ্রভাবে দৃষ্টিপাত করেন এবং তারপরই ব্যষ্টি বা বিশেষ ভাবগুলি যে সামান্য ভাবের অন্তর্গত, তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। সর্বভূতের মধ্যে এই 'সামান্য' (universal) ভাবের অন্বেষণেই ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের লক্ষ্য। জ্ঞানীর লক্ষ্য–যাঁহাকে জানিলে সমুদয় জানা যায়, সেই সমষ্টিভূত, এক, নিরপেক্ষ, সর্বভূতের মধ্যগত সামান্যভাবস্বরূপ পুরুষকে জানা। ভক্ত চান–যাঁহাকে ভালবাসিলে এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ভালবাসা জন্মে, সেই সর্বগত পুরুষপ্রধানকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে; যোগীর আকাঙ্ক্ষা–সেই সকলের মূলীভূত শক্তিকে জয় করা, যাহাকে জয় করিলে সমুদয় জগৎকে জয় করা যায়। ভারতবাসীর মনের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করিলে জানা যায়, কি জড়বিজ্ঞান, কি মনোবিজ্ঞান, কি ভক্তিতত্ত্ব, কি দর্শন–সর্ব বিভাগেই উহা চিরকাল এই বহুর মধ্যে এক সর্বগত তত্ত্বের অপূর্ব অনুসন্ধানে নিয়োজিত।

ভক্ত ক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যদি একজনের পর আর একজনকে ভালবাসিতে থাকো, তবে তুমি অনন্তকালের জন্য উত্তরোত্তর অধিকসংখ্যক ব্যক্তিকে ভালবাসিয়া যাইতে পার, কিন্তু সমগ্র জগৎকে মোটেই ভালবাসিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু অবশেষে যখন এই মূল সত্য অবগত হওয়া যায় যে, ঈশ্বর সমুদয় প্রেমের সমষ্টিস্বরূপ, মুক্ত মুমুক্ষু বদ্ধ–জগতের সকল জীবাত্মার সকল আকাঙ্ক্ষার সমষ্টিই ঈশ্বর, তখনই সাধকের পক্ষে সর্বজনীন প্রেম সম্ভব হইতে পারে। ভক্ত বলেনঃ ভগবান্ সমষ্টি এবং সেই

দৃশ্যমান জগৎ ভগবানের পরিচ্ছিন্ন ভাব–ভগবানের অভিব্যক্তি মাত্র। সমষ্টিকে ভালবাসিলে সমুদয় জগৎকেই ভালবাসা হইল। তখনই জগতের প্রতি ভালবাসা ও জগতের হিতসাধন–সবই সহজ হইবে। প্রথমে ভগবৎপ্রমের দ্বারা আমাদিগকে এই শক্তিলাভ করিতে হইবে, নতুবা জগতের হিতসাধন করা সম্ভব হইবে না। ভক্ত বলেনঃ সবই তাঁহার, তিনি আমার প্রিয়তম, আমি তাঁহাকে ভালবাসি। এইরূপ ভক্তের নিকট ক্রমশঃ সবই পবিত্র বলিয়া বোধ হয়, কারণ সবই তাঁহার। সকলেই তাঁহার সন্তান, তাঁহার অঙ্গস্বরূপ, তাঁহারই প্রকাশ। তখন কিভাবে অপরকে আঘাত করিতে পারি? কিরূপেই বা অপরকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি? ভগবৎপ্রেম আসিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিশ্চিত ফলস্বরূপ সর্বভূতে প্রেম আসিবে। আমরা যতই ভগবানের দিকে অগ্রসর হই, ততই সমুদয় বস্তুকে তাঁহার ভিতর দেখিতে পাই। যখন সাধক এই পরাভক্তিলাভে সমর্থ হন, তখন ঈশ্বরকে সর্বভূতে দর্শন করিতে আরম্ভ করেন, এইরূপে আমাদের হৃদয় প্রেমের এক অনন্ত প্রস্রবণ হইয়া দাঁড়ায়। যখন আমরা এই প্রেমের আরও উচ্চস্তরে উপনীত হই, তখন এই জগতের সকল পদার্থের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা একেবারে দূরীভূত হয়। মানুষকে তখন আর মানুষ বলিয়া বোধ হয় না, ভগবান্ বলিয়াই বোধ হয়; অপরাপর জীবজন্তুও আর জীবজন্তু বলিয়া বোধ হয় না, ঈশ্বর বলিয়াই বোধ হয়। এমন কি, ব্যাঘ্রকেও ব্যাঘ্র বলিয়া বোধ হইবে না, ভগবানেরই এক প্রকাশ বলিয়া বোধ হইবে। ‘এইরূপে এই প্রগাঢ় ভক্তির অবস্থায় সর্বপ্রাণীই আমাদের উপাস্য হইয়া পড়ে। সর্বভূতে হরিকে অবস্থিত জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি সকলকে অবিচলিতভাবে ভালবাসেন।’ ১০

এইরূপ প্রগাঢ় সর্বব্যাপক প্রেমের ফল পূর্ণ আত্মনিবেদন ও ‘অপ্রতিকূল্য’; এ অবস্থায় দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, সংসারে যাহা কিছু ঘটে, তাহার কিছুই আমাদের অনিষ্টকর নয়। তখনই সেই প্রেমিক পুরুষ–দুঃখ আসিলে বলতে পারেন, ‘স্বাগত দুঃখ’; কষ্ট আসিলে বলিতে পারেন, ‘এস কষ্ট, তুমিও আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে আসিতেছ।’ সর্প আসিলে সর্পকেও তিনি স্বাগত সম্ভাষণ করিতে পারেন। মৃত্যু আসিলে এরূপ ভক্ত মৃত্যুকে সহাস্যে অভিনন্দন করিতে পারেন। ‘ধন্য আমি, আমার নিকট ইহারা আসিতেছে, সকলেই স্বাগত।’ ভগবান্ ও যাহা কিছু তাঁহার–সেই সকলের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম হইতে প্রসূত এই

পূর্ণ নির্ভরতার অবস্থায় ভক্তের নিকট সুখ ও দুঃখের বিশেষ প্রভেদ থাকে না। তিনি তখন দুঃখকষ্টের জন্য আর অভিযোগ করেন না। আর প্রেমস্বরূপ ভগবানের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা অবশ্যই মহাবীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপজনিত যশোরাশি অপেক্ষা অধিকতর বাঞ্ছনীয়।'

অধিকাংশ মানুষের কাছে দেহই সর্বস্ব। দেহই তাহাদের নিকট সমগ্র বিশ্ব, দেহের সুখই তাহাদের চরম লক্ষ্য। এই দেহ ও দৈহিক ভোগ্যবস্তুকে উপাসনা করা-রূপ আসুরিক ভাব আমাদের সকলের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। আমরা খুব লম্বা-চওড়া কথা বলিতে পারি, যুক্তির স্তরে খুব উচ্চে উড়িতে পারি, তথাপি আমরা শকুনির মত; যতই উচ্চে উঠিয়াছি মনে করি না কেন, আমাদের মন ভাগাড়ে গলিত শবের মাংসখণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট। জিজ্ঞাসা করি, আমাদের শরীরকে ব্যাঘ্রের কবল হইতে রক্ষা করিতে হইবে কেন? ব্যাঘ্রের ক্ষুধা নিবারণের জন্য আমরা এই শরীর তাহাকে দিতে পারি না কেন? উহাতে তো ব্যাঘ্রের তৃপ্তি হইবে; এই কার্যের সহিত আত্মোৎসর্গ ও উপাসনার কি খুব বেশী প্রভেদ? অহংকে সম্পূর্ণরূপে নাশ করিতে পার না কি? প্রেমধর্মের ইহা অতি উচ্চ চূড়া, আর অতি অল্প লোকই এই অবস্থা লাভ করিয়াছে। কিন্তু যতদিন না মানুষ সর্বদা এইরূপ আত্মত্যাগের জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রস্তুত হয়, ততদিন সে পূর্ণ ভক্ত হইতে পারে না। আমরা সকলেই কমবেশী কিছু কালের জন্য শরীরটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারি এবং অল্পাধিক স্বাস্থ্যসম্ভোগও করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে কি হইল? আমরা শরীরের যতই যত্ন লই না কেন, শরীর তো একদিন যাইবেই। ইহার কোন স্থায়িত্ব নাই। ধন্য তাহারা, যাহাদের শরীর অপরের সেবা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 'সাধু ব্যক্তি কেবল অপরের সেবার জন্য ধন, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে সদা প্রস্তুত হইয়া থাকেন। এই জগতে মৃত্যুই একমাত্র সত্য—এখানে যদি আমাদের দেহ কোন মন্দ কাজে না গিয়া ভাল কাজে যায়, তবে তাহা খুব ভাল বলিতে হইবে।'১১ আমরা কোন রূপে পঞ্চাশ—জোর এক-শ বছর বাঁচিতে পারি, কিন্তু তার পর?—মৃত্যু। যাহা কিছু মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই বিশ্লিষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। এমন সময় আসিবে, যখন উহা বিশ্লিষ্ট হইবেই হইবে।

ঈশা, বুদ্ধ, মহম্মদ, জগতের বড় বড় মহাপুরুষ এবং আচার্যরা সকলেই এই পথে গিয়াছেন।

ভক্ত বলেন—এই ক্ষণস্থায়ী জগতে, যেখানে সবই ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতেছে, এখানে আমরা যতটুকু সময় পাই, সেটুকুরই সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। আর বাস্তবিক জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার—জীবনকে সর্বভূতের সেবায় নিযুক্ত করা। ভয়ানক দেহবুদ্ধিই জগতে সর্বপ্রকার স্বার্থপরতার মূল। আমাদের মহাভ্রমঃ এই শরীরটি আমি; যে কোন প্রকারে হউক, উহাকে রক্ষা করিতে হইবে ও উহার স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে হইবে। এই ভাবই আমাদের পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে দেয় না। যদি নিশ্চিতভাবে জানো যে, তুমি শরীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, তবে এই জগতে এমন কিছুই নাই, যাহার সহিত তোমার বিরোধ উপস্থিত হইবে; তখন তুমি সর্বপ্রকার স্বার্থপরতার অতীত হইয়া গেলে। এই জন্য ভক্ত বলেন, 'আমাদিগকে জগতের সকল পদার্থ সম্বন্ধে মৃতবৎ থাকিতে হইবে,' এবং ইহাই বাস্তবিক আত্মসমর্পণ—শরণাগতি। 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক'—এই বাক্যের অর্থই ঐ আত্মসমর্পণ বা শরণাগতি। স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করা এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে করা—ভগবানের ইচ্ছাতেই আমাদের দুর্বলতা ও সাংসারিক আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়া থাকে, ইহা নির্ভরতা নয়। হইতে পারে, আমাদের স্বার্থপূর্ণ কার্যাদি হইতেও ভবিষ্যতে আমাদের মঙ্গল হয়, কিন্তু তাহা ভগবান্ দেখিবেন, তাহাতে তোমার আমার কিছু করিবার নাই। প্রকৃত ভক্ত নিজের জন্য কখনও কিছু ইচ্ছা করেন না বা কোন কার্য করেন না। 'প্রভু লোকে তোমার নামে বড় বড় মন্দির নির্মাণ করে, তোমার নামে কত দান করে; আমি দরিদ্র, আমার কিছু নাই, তাই আমার এই দেহ তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম। প্রভু, আমায় ত্যাগ করিও না।'—ইহাই ভক্তহৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে উত্থিত প্রার্থনা। যিনি একবার এই অবস্থার আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহার নিকট এই প্রিয়তম প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ—জগতের সমুদয় ধন, প্রভুত্ব, এমন কি মানুষ যতদূর মান যশ ও ভোগসুখের আশা করিতে পারে, তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হয়। ভগবানে নির্ভরজনিত 'এই শান্তি আমাদের বুদ্ধির অতীত' ও অমূল্য। আত্মসমর্পণ হইতে এই 'অপ্রাতিকূল্য'-অবস্থা লাভ হইলে সাধকের আর কোনরূপ স্বার্থ থাকে না; আর স্বার্থই যখন নাই, তখন আর তাঁহার স্বার্থহানিকর বস্তু

জগতে কি থাকিতে পারে? এই পরম নির্ভরের অবস্থায় সর্বপ্রকার আসক্তি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়, কেবল সেই সর্বভূতের অন্তরাত্মা ও আধারস্বরূপ ভগবানের প্রতি সর্বাবগাহী ভালবাসা অবশিষ্ট থাকে। ভগবানের প্রতি এই আসক্তি জীবাত্মার বন্ধনের কারণ নয়, বরং উহা নিঃশেষে তাহার সর্ব বন্ধন মোচন করে।

৬. পরাবিদ্যা ও পরাভক্তি এক

উপনিষদ্ পরা ও অপরা নামক দুইটি বিদ্যা পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন; আর ভক্তের নিকটে এই পরাবিদ্যা ও পরাভক্তিতে বাস্তবিক কিছু প্রভেদ নাই। মুণ্ডক উপনিষদে কথিত আছে, 'ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলেন, জানিবার যোগ্য দুই প্রকার বিদ্যা—পরা ও অপরা। উহার মধ্যে অপরা বিদ্যা—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা অর্থাৎ উচ্চারণ যতি ইত্যাদির বিদ্যা, কল্প অর্থাৎ যজ্ঞপদ্ধতি, ব্যাকরণ, নিরুক্ত অর্থাৎ বৈদিক শব্দসমুহের ব্যুৎপত্তি ও তাহাদের অর্থ যে শাস্ত্রের দ্বারা জানা যায়, এবং ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। আর পরাবিদ্যা তাহাই, যাহা দ্বারা সেই অক্ষরকে জানিতে পারা যায়।' ১২

সুতরাং স্পষ্ট দেখা গেল যে, এই পরাবিদ্যাই ব্রহ্মজ্ঞান। দেবীভাগবতে১৩ পরাভক্তির এই লক্ষণগুলি পাইঃ তৈল যেমন এক পাত্র হইতে পাত্রান্তরে ঢালিবার সময় অবিছিন্ন ধারায় পতিত হয়, তেমনি মন যখন অবিচ্ছিন্নভাবে ভগবানকে স্মরণ করিতে থাকে, তখনই পরাভক্তির উদয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অবিচ্ছিন্ন অনুরাগের সহিত ভগবানের দিকে হৃদয় ও মনের এরূপ অবিরত ও নিত্য স্থিরতাই মানব-হৃদয়ে সর্বোচ্চ ভগবৎ-প্রেমের প্রকাশ। আর সকল প্রকার ভক্তি কেবল এই পরাভক্তির—'রাগানুগা' ভক্তির সোপানমাত্র। যখন সাধকের হৃদয়ে পরানুরাগের উদয় হয়, তখন তাঁহার মন সর্বদাই ভগবানের চিন্তা করিবে, আর কিছুই তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইবে না। তিনি নিজ মনে তখন ভগবানের চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তাকে স্থান দিবেন না। তাঁহার আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হইয়া মনোজগতের ও জড়জগতের স্থূল সূক্ষ্ম সর্বপ্রকার বন্ধন অতিক্রম করিয়া শান্ত ও মুক্ত ভাব ধারণ করিবে। এরূপ লোকই কেবল ভগবানকে নিজ হৃদয়ে উপাসনা করিতে সক্ষম| তাঁহার নিকটে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, প্রতীক ও প্রতিমা, শাস্ত্রাদি ও মতামত সবই অনাবশ্যক হইয়া পড়ে—উহাদের দ্বারা তাঁহার আর কোন উপকার হয় না। ভগবানকে এরূপভাবে ভালবাসা বড় সহজ নয়।

সাধারণ মানবীয় ভালবাসা–যেখানে প্রতিদান পায়, সেখানেই বৃদ্ধি পায়; যেখানে প্রতিদান না পায়, সেখানে উদাসীনতা আসিয়া ভালবাসার স্থান অধিকার করে। নিতান্ত অল্প ক্ষেত্রেই কিন্তু কোনরূপ প্রতিদান না পাইলেও প্রেমের বিকাশ দেখা যায়। একটি দৃষ্টান্ত দিবার জন্য আমরা অগ্নির প্রতি পতঙ্গের ভালবাসার সহিত ইহার তুলনা করিতে পারি। পতঙ্গ আগুনকে ভালবাসে, আর উহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে। পতঙ্গের স্বভাবই এইভাবে অগ্নিকে ভালবাসা। জগতে যত প্রকার প্রেম দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কেবল প্রেমের জন্যই যে প্রেম, তাহাই সর্বোচ্চ ও পূর্ণ নিঃস্বার্থ প্রেম। এইরূপ প্রেম আধ্যাত্মিকতার ভূমিতে কার্য করিতে আরম্ভ করিলেই পরাভক্তিতে লইয়া যায়।

৭. প্রেম ত্রিকোণাত্মক

প্রেমকে আমরা একটি ত্রিকোণ-রূপে প্রকাশ করিতে পারি, উহার কোণগুলিই যেন উহার তিনটি অবিভাজ্য বৈশিষ্ট্যের প্রকাশক। তিনটি কোণ ব্যতীত একটি ত্রিকোণ বা ত্রিভুজ সম্ভব নয়, আর এই তিনটি লক্ষণ ব্যতীত প্রকৃত প্রেম সম্ভব নয়। প্রেম-রূপ এই ত্রিকোণের একটি কোণঃ প্রেমে কোন দর-কষাকষি বা কেনা-বেচার ভাব নাই। যেখানে কোন প্রতিদানের আশা থাকে, সেখানে প্রকৃত প্রেম সম্ভব নয়; সে- ক্ষেত্রে উহা কেবল দোকানদারিতে পরিণত হয়। যতদিন পর্যন্ত আমাদের ভগবানের প্রতি ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও আনুগত্য পালনের জন্য তাঁহার নিকট কোন-না-কোন অনুগ্রহ-প্রাপ্তির ভাব থাকে, ততদিন আমাদের হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম থাকিতে পারে না। ভগবানের নিকট কিছু প্রাপ্তির আশায় যাহারা উপাসনা করে, তাহারা ঐ অনুগ্রহ-প্রাপ্তির আশা না থাকিলে তাঁহাকে উপাসনা করিবে না। ভক্ত ভগবানকে ভালবাসেন—তিনি প্রেমাস্পদ বলিয়া, প্রকৃত ভক্তের এই দিব্য ভাবাবেগের আর কোন হেতু নাই।

কথিত আছে, কোন সময়ে এক বনে এক রাজার সহিত জনৈক সাধুর সাক্ষাৎ হয়। তিনি সাধুর সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ করিয়াই তাঁহার পবিত্রতা ও জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। পরিশেষে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, 'আমাকে কৃতার্থ করিবার জন্য আমার নিকট কিছু গ্রহণ করিতে হইবে।' সাধু কিছু গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন ও বলিলেন, 'বনের ফল আমার প্রচুর আহার, পর্বত-নিঃসৃত পবিত্র সরিৎ আমার পর্যাপ্ত পানীয়, বৃক্ষত্বক্ আমার পর্যাপ্ত পরিধেয় এবং গিরিগুহা আমার যথেষ্ট বাসস্থান। কেন আমি তোমার বা অপরের নিকট কিছু লইব?' রাজা বলিলেন, 'আমাকে অনুগৃহীত করিবার জন্য আমার সহিত রাজধানীতে রাজপ্রসাদে চলুন এবং আমার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করুন।' অনেক অনুনয়ের পর তিনি অবশেষে রাজার সহিত যাইতে স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার সহিত প্রাসাদে গেলেন। দান করিবার পূর্বে রাজা পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেনঃ হে ভগবান্ আমাকে আরও সন্তান-সন্ততি দাও, আরও ধন দাও, আরও রাজ্য দাও, আমার

শরীর নীরোগ কর, ইত্যাদি। রাজার প্রার্থনা শেষ হইবার পূর্বেই সাধু নীরবে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া রাজা হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্‌গমন করিতে করিতে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, 'প্রভু, আমার দান গ্রহণ না করিয়াই চলিয়া গেলেন?' সাধু তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুকের কাছে আমি ভিক্ষা করি না। তুমি নিজে তো একজন ভিক্ষুক; তুমি আবার কিভাবে আমাকে কিছু দিতে পার? আমি এত মূর্খ নই যে, ভিক্ষুকের নিকট দান গ্রহণ করিব। যাও আমার অনুসরণ করিও না।'

এই গল্পটিতে ধর্মরাজ্যে ভিক্ষুক আর ভগবানের প্রকৃত ভক্তদের ভিতর বেশ প্রভেদ দেখানো হইয়াছে। কোন বরলাভের জন্য, এমন কি মুক্তিলাভের জন্যও ভগবানের উপাসনা করা অধম উপাসনা। প্রেম কোন পুরস্কার চায় না, প্রেম সর্বদা প্রেমেরই জন্য। ভক্ত ভগবানকে ভালবাসেন, কারণ তিনি না ভালবাসিয়া থাকিতে পারেন না। দৃষ্টান্তঃ তুমি একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া উহা ভালবাসিয়া ফেলিলে; তুমি ঐ দৃশ্যের নিকট হইতে কোনরূপ অনুগ্রহ ভিক্ষা কর না, আর সেই দৃশ্যও তোমার নিকট কিছুই প্রার্থনা করে না; তথাপি উহা দর্শন করিয়া তোমার মনে আনন্দের উদয় হয়—উহা তোমার মনের অশান্তি দূর করিয়া দেয়, উহা তোমাকে শান্ত করিয়া দেয়, তোমাকে ক্ষণকালের জন্য একরূপ মর্ত্য স্বভাবের ঊর্ধ্বে লইয়া যায় এবং এক স্বর্গীয় আনন্দে মনকে শান্ত করিয়া দেয়। ইহাতে প্রকৃত প্রেমের ভাব, এবং এই বৈশিষ্ট্যই উক্ত ত্রিকোণাত্মক প্রেমের একটি কোণ। অতএব প্রেমের পরিবর্তে কিছু চাহিও না, সর্বদা দাতার আসন গ্রহণ কর। ভগবানকে তোমার প্রেম নিবেদন কর, পরিবর্তে তাঁহার নিকট কিছু চাহিও না।

প্রেমরূপ ত্রিকোণের দ্বিতীয় কোণঃ প্রেমে কোনরূপ ভয় নাই। যাহারা ভয়ে ভগবানকে ভালবাসে, তাহারা মনুষ্যাধম; তাহাদের মনুষ্যভাবই পূর্ণ বিকশিত হয় নাই। তাহারা শাস্তির ভয়ে ভগবানকে উপাসনা করে। তাহারা মনে করে ভগবান্ এক বিরাট পুরুষ, তাঁহার এক হস্তে দণ্ড, এক হস্তে চাবুক; তাঁহার আজ্ঞা পালন না করিলে তাহারা দণ্ডিত হইবে। ভগবানকে দণ্ডের ভয়ে উপাসনা করা অতি নিম্নশ্রেণীর উপাসনা। এইরূপ উপাসনাকে যদি উপাসনা বলিতে হয়, তবে উহা অতি অপরিণত ভাবেরই উপাসনা।

যতদিন হৃদয়ে কোনরূপ ভয় থাকে, ততদিন সেখানে ভালবাসাও থাকিবে কি করিয়া? প্রেম স্বভাবতই সমুদয় ভয়কে জয় করিয়া ফেলে। কল্পনা কর, এক তরুণী জননী পথে চলিয়াছেন; একটি কুকুর ডাকিলেই তিনি ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি নিকটতম কোন গৃহে প্রবেশ করেন। কিন্তু যদি তাঁহার শিশু তাঁহার সঙ্গে থাকে এবং যদি একটি সিংহ শিশুটির উপর লাফাইয়া পড়ে, তখন সেই জননী কোথায় থাকিবেন?—সিংহের মুখে। শিশুটিকে বাঁচাইবার জন্য অবশ্যই তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন। ভালবাসা সর্ববিধ ভয়কে জয় করে। আমি জগৎ হইতে পৃথক্—এই প্রকার একটি স্বার্থপর ভাব হইতেই ভয় জন্মে। মনকে সঙ্কীর্ণ করিয়া আমি নিজেকে যত স্বার্থপর করিয়া ফেলিব, আমার ভয়ও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। যদি কেহ মনে করে, সে কোন কাজের নয়, নিশ্চয়ই সে ভয়ে অভিভূত হইবে। আর নিজেকে যতই তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র বলিয়া না ভাবিবে, ততই তোমার ভয় কমিয়া যাইবে। যতদিন তোমার একবিন্দু ভয় আছে, ততদিন তোমার মধ্যে প্রেম থাকিতে পারে না। প্রেম ও ভয় দুইটি একত্র থাকিতে পারে না। যাঁহারা ভগবানকে ভালবাসেন, তাঁহারা কখনই তাঁহাকে ভয় করিবেন না। 'ভগবানের নাম বৃথা লইও না'—এই আদেশ শুনিয়া প্রকৃত ভগবৎপ্রেমিক হাসিয়া উঠেন। প্রেমের ধর্মে ভগবন্নিন্দা কোথায়? যেরূপেই হউক, প্রভুর নাম যত লইতে পার, ততই মঙ্গল। প্রকৃত ভক্ত তাঁহাকে ভালবাসে, তাই তো তাঁহার নাম করে।

প্রেমরূপ ত্রিকোণের তৃতীয় কোণঃ প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বীর স্থান নাই। প্রেমিকের আর দ্বিতীয় ভালবাসার পাত্র থাকিবে না, কারণ প্রেমেই প্রেমিকের সর্বোচ্চ আদর্শ রূপায়িত। যতদিন না ভালবাসার পাত্র আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়, ততদিন প্রকৃত প্রেম সম্ভব নয়। হইতে পারে, অনেক স্থলে মানুষের ভালবাসা ভুল পথে চালিত হয়, অপাত্রে অর্পিত হয়, কিন্তু প্রেমিকের পক্ষে তাঁহার প্রেমাস্পদ সর্বদা তাহার সর্বোচ্চ আদর্শ। একজন হয়তো জঘন্যতম ব্যক্তিকে ভালবাসিতেছে, আর একজন—মহত্তম এক ব্যক্তিকে ভালবাসিতেছে, তা সত্ত্বেও উভয়ত্র নিজ আদর্শকেই ভালবাসা হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির উচ্চতম আদর্শকেই 'ঈশ্বর' বলা হয়। অজ্ঞ বা জ্ঞানী, সাধু বা পাপী, নর বা নারী, শিক্ষিত বা

অশিক্ষিত–সকলেরই উচ্চতম আদর্শ ঈশ্বর। সমুদয় সৌন্দর্য, মহত্ত্ব ও শক্তির উচ্চতম আদর্শসমূহ সমন্বিত করিলেই প্রেমময় ও প্রেমাস্পদ ভগবানের পূর্ণতম ভাব পাওয়া যায়।

এই আদর্শগুলি প্রত্যেক ব্যক্তির মনে কোন না কোনরূপে স্বভাবতই বর্তমান। উহারা যেন আমাদেরই মনের অঙ্গ বা অংশবিশেষ। মানবপ্রকৃতিতে যে সকল ক্রিয়ার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐগুলি সবই আদর্শকে ব্যাবহারিক জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা। আমরা আমাদের চতুর্দিকে সমাজে যে নানাবিধ কর্মের প্রকাশ ও আন্দোলন দেখিতে পাই, তাহা ভিন্ন ভিন্ন আত্মার বিভিন্ন আদর্শকে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টার ফলমাত্র। ভিতরে যাহা আছে, তাহাই বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতেছে। মানবহৃদয়ে আদর্শের এই চিরপ্রবল প্রভাবেই একমাত্র প্রেরণাশক্তি, যাহা মানবজাতির মধ্যে সতত ক্রিয়াশীল। হইতে পারে, শত শত জন্মের পর, সহস্র সহস্র বৎসর চেষ্টার পর মানুষ বুঝিতে পারে–আমাদের অন্তরের আদর্শ আনুযায়ী বাহিরকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা বা বাহিরের অবস্থাসমূহের সহিত ভিতরের আদর্শকে সম্পূর্ণ খাপ খাওয়াইবার চেষ্টা বৃথা। এইটি বুঝিতে পারিলে সাধক বহির্জগতে নিজের আদর্শ প্রক্ষেপ করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সেই উচ্চতম প্রেমের ভূমি হইতে আদর্শকেই আদর্শরূপে উপাসনা করে। সমুদয় নিম্নস্তরের আদর্শগুলি এই পূর্ণ আদর্শের অন্তর্গত।

সকলেই এই কথার সত্যতা স্বীকার করেন যে, কুরূপার মধ্যেও প্রেমিক হেলেনের সৌন্দর্য দেখিয়া থাকেন। বাহিরের লোক বলিতে পারে, প্রেম অপাত্রে প্রদত্ত হইতেছে, কিন্তু প্রেমিক কুরূপা দেখেন না, তিনি তাঁহার হেলেনকেই দেখিয়া থাকেন। সুন্দর বা কুৎসিত যাহাই হউক, প্রেমের আধার প্রকৃতপক্ষে যেন একটি কেন্দ্র, তাহার চারিদিকে আমাদের আদর্শগুলি রূপায়িত হয়। সাধারণতঃ মানুষ কিসের উপাসনা করে?–অবশ্য শ্রেষ্ঠ ভক্ত প্রেমিকের সর্বাবগ্রাহী পূর্ণ ভাবাদর্শ নয়। নরনারীগণ সাধারণতঃ নিজ নিজ অন্তরের আদর্শকেই উপাসনা করে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শকে বাহিরে আনিয়া তাহারই সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে। তাই তো আমরা দেখিতে পাই, যাহারা নিজেরা নিষ্ঠুর ও রক্তপিপাসু, তাহারা এক রক্তপিপাসু ঈশ্বর কল্পনা করে, কারণ তাহারা কেবল নিজ

নিজ ভাবের উচ্চতম আদর্শকেই ভালবাসিতে পারে। এই জন্যই সদ্‌ভাবাপন্ন ব্যক্তির ঈশ্বরের আদর্শ অতি উচ্চ, তাঁহার আদর্শ অপর ব্যক্তির আদর্শ হইতে অত্যন্ত পৃথক্।

৮. প্রেমের ভগবানের প্রমাণ তিনিই

যে প্রেমিক ব্যক্তি স্বার্থপরতা, লাভের আকাঙ্ক্ষা ও পরিবর্ত-ভাবের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছেন এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে যাঁহার কোন ভয় নাই, তাঁহার আদর্শ কি? মহামহিমময় ঈশ্বরকেও তিনি বলিবেন, 'আমি তোমাকে আমার সর্বস্ব দিয়াছি, আমার নিজের বলিতে আর কিছুই নাই, তথাপি তোমার নিকট হইতে আমি আর কিছুই চাই না। বাস্তবিক এমন কিছুই নাই, যাহা আমি 'আমার' বলিতে পারি।' সাধক যখন এই দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করেন, তখন তাহার আদর্শ প্রেমজনিত পূর্ণ নির্ভীকতার আদর্শে পরিণত হয়। এই প্রকার সাধকের সর্বোচ্চ আদর্শে কোন প্রকার 'বিশেষত্ব'রূপ সঙ্কীর্ণতা থাকে না। উহা সার্বভৌম প্রেম, অনন্ত ও অসীম প্রেম, উহাই প্রেমস্বরূপ। প্রেমের এই মহান্ আদর্শকে তখন সেই সাধক কোনরূপ প্রতীক বা প্রতিমার সহায়তা না লইয়াই উপাসনা করেন। এই সর্বাবগাহী প্রেমকে 'ইষ্ট' বলিয়া উপাসনা করাই পরাভক্তি। অন্য সকল প্রকার ভক্তি কেবল উহা লাভের সোপানমাত্র।

এই প্রেমধর্ম অনুসরণ করিতে করিতে আমরা যে সফলতা বা বিফলতার সম্মুখীন হই, সে-সব এই আদর্শলাভের পথেই ঘটে। অন্তরে একটির পর একটি বস্তু গৃহীত হয় এবং আমাদের আদর্শ উহার উপর একে একে প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে। ক্রমশঃ এই সমুদয় বাহ্যবস্তুই ক্রমবিস্তারশীল সেই অভ্যন্তরীণ আদর্শকে প্রকাশ করিতে অক্ষম হয়, এবং ভক্ত স্বভাবতই একটির পর একটি আদর্শ পরিত্যাগ করেন। অবশেষে সাধক বুঝিতে থাকেন, বাহ্যবস্তুতে আদর্শ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা বৃথা, আদর্শের সহিত তুলনায় সকল বাহ্যবস্তুই অতি তুচ্ছ। কালক্রমে তিনি সেই সর্বোচ্চ ও সম্পূর্ণ প্রেম লাভ করেন। উহা তাঁহার অন্তরে জীবন্ত ও সত্যস্বরূপে অনুভূত হয়। যখন ভক্ত এই অবস্থায় উপনীত হন, তখন 'ভগবানকে প্রমাণ করা যায় কিনা? ভগবান্ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান কিনা?'—এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার আর ইচ্ছাই হয় না। তাঁহার নিকট ভগবান্ প্রেমময়, প্রেমের সর্বোচ্চ আদর্শ এবং এই ভাবই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। প্রেমরূপ বলিয়া ঈশ্বর

স্বতঃসিদ্ধ, অন্যপ্রমাণ-নিরপেক্ষ। প্রেমিকের নিকট প্রেমময়ের অস্তিত্ব-প্রমাণের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই।শাসক ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে অন্যান্য ধর্মের অনেক যুক্তি আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু ভক্ত এরূপ ঈশ্বরের চিন্তা করেন না বা করিতে পারেন না। এখন তাঁহার নিকট ভগবান্ কেবল প্রেমস্বরূপে বর্তমান। সকলের অন্তর্যামিরূপে তাঁহাকে অনুভব করিয়া ভক্ত আনন্দে বলিয়া উঠেন, 'কেহই পতির জন্য পতিকে ভালবাসে না, পতির অন্তর্যামী আত্মার জন্যই পতিকে ভালবাসে। কেহই পত্নীর জন্য পত্নীকে ভালবাসে না, পত্নীর অন্তর্যামী আত্মার জন্যই পত্নীকে ভালবাসে।'

কেহ কেহ বলেন, স্বার্থপরতাই মানুষের সর্বপ্রকার কর্মের মূল। উহাও প্রেম, তবে (কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ হইয়া) 'বিশেষ'-ভাবাপন্ন হওয়ায় উহা নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে মাত্র। যখন আমি নিজেকে জগতের সকল বস্তুতে অবস্থিত ভাবি, তখন আমার প্রেম বিশ্বব্যাপী হয় এবং আমাতে স্বার্থপরতা থাকিতে পারে না। কিন্তু যখন আমি ভ্রমবশতঃ নিজেকে বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র প্রাণী মনে করি, তখন আমার প্রেম সঙ্কীর্ণ ও 'বিশেষ' ভাব ধারণ করে। প্রেমের বিষয়কে সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করায় আমাদের ভ্রম দৃঢ় হইয়া যায়। এই জগতের সকল বস্তুই ঈশ্বর-প্রসূত, সুতরাং ভালবাসার যোগ্য। কিন্তু ইহা সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, সমষ্টিকে ভালবাসিলে অংশগুলিকেও ভালবাসা হইল। এই সমষ্টিই—প্রেমের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত ভক্তগণের ভগবান্। ঈশ্বর-বিষয়ক অন্যান্য ভাব, যথা—স্বর্গস্থ পিতা, শাস্তা, স্রষ্টা, নানাবিধ মতামত, শাস্ত্র প্রভৃতি এরূপ ভক্তের নিকট নিরর্থক; তাঁহাদের নিকট এ-সবের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, কারণ পরাভক্তির প্রভাবে তাঁহারা একেবারে এই-সকলের ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছেন।

যখন অন্তর শুদ্ধ, পবিত্র এবং ঐশ্বরিক প্রেমামৃতে পরিপূর্ণ হয়, তখন 'ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ'—এই ভাব ব্যতীত ঈশ্বরের অন্য সর্বপ্রকার ধারণা বালকোচিত ও অসম্পূর্ণ বা অনুপযুক্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। বাস্তবিক পরাভক্তির প্রভাবই এইরূপ। তখন সে সিদ্ধ ভক্ত তাঁহার ভগবানকে মন্দিরে বা গির্জায় দর্শন করিতে যান না; তিনি এমন স্থানই দেখিতে পান না—যেখানে ভগাবন্ নাই। তিনি তাঁহাকে মন্দিরের ভিতরে দেখিতে পান, বাহিরেও দেখিতে

পান, সাধুর সাধুতায় দেখিতে পান, পাপীর পাপেও দেখিতে পান, কারণ তিনি যে পূর্বেই তাঁহাকে নিত্যদীপ্তিমান্ ও নিত্যবর্তমান এক সর্বশক্তিমান্ অনির্বাণ প্রেমজ্যোতিঃরূপে নিজ হৃদয়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

৯. মানবীয় ভাষায় ভগবৎ-প্রেমের বর্ণনা

মানবীয় ভাষায় প্রেমের এই সর্বোচ্চ আদর্শ প্রকাশ করা অসম্ভব। উচ্চতম মানব-কল্পনাও উহার অনন্ত পূর্ণতা ও সৌন্দর্য অনুভব করিতে অক্ষম। তথাপি সর্বদেশের নিম্ন ও উচ্চ ভাবের প্রেমধর্মের সাধকগণকে তাঁহাদের প্রেমের আদর্শ বুঝিতে বা বুঝাইতে চিরকালই এই অনুপযোগী মানবীয় ভাষা ব্যবহার করিতে হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, বিভিন্ন প্রকারের মানবীয় প্রেমই এই অব্যক্ত ভগবৎ-প্রেমের প্রতীকরূপে গৃহীত হইয়াছে। মানব ঐশ্বরিক বিষয়সমূহ নিজের মানবীয় ভাবেই চিন্তা করিতে পারে, এবং সেই পূর্ণ কেবল আমাদের আপেক্ষিক ভাষাতেই আমাদের নিকট প্রকাশিত হইতে পারে। সমুদয় জগৎ আমাদের নিকট যেন সীমার ভাষায় লেখা অসীমের কথা। এই কারণেই ভক্তেরা ভগবান্ ও তাঁহার উপাসনা-বিষয়ে লৌকিক প্রেমের লৌকিক ভাষা ও শব্দসমূহ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পরাভক্তির কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা এই দিব্য প্রেম বিভিন্ন উপায়ে বুঝিতে বা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থাকে ‘শান্ত ভক্তি’ বলে। যখন মানুষের হৃদয়ে প্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত হয় নাই, বাহ্য অনুষ্ঠানমূলক প্রতীকোপাসনা অপেক্ষা একটু উন্নত সাধারণ শান্ত ভালবাসার উদয় হইয়াছে মাত্র, উহাতে তীব্রবেগসম্পন্ন প্রেমের উন্মত্ততা মোটেই নাই, তখন ঐ ভাবকে ‘শান্ত ভক্তি’ বলে। দেখিতে পাই, জগতে কতক লোক আছেন, তাঁহারা ধীরে ধীরে সাধনপথে অগ্রসর হইতে ভালবাসেন, আর কিছু লোক আছেন, তাঁহারা ঝড়ের মত বেগে চলিয়া যান। ‘শান্ত-ভক্ত’ ধীর শান্ত নম্র। তদপেক্ষা একটু উচ্চতর ভাব—‘দাস্য’; এ অবস্থায় মানুষ নিজেকে ঈশ্বরের দাস ভাবে। বিশ্বাসী ভৃত্যের প্রভুভক্তিই তাঁহার আদর্শ।

তার পর 'সখ্য-প্রেম'—এই সখ্য-প্রেমের সাধক ভগবানকে বলিয়া থাকেন, 'তুমি আমার প্রাণের সখা।'১৪ এরূপ ভক্ত ভগবানের কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করে, যেমন মানুষ বন্ধুর নিকট নিজের হৃদয় খোলে, এবং জানে—বন্ধু তাহার দোষের জন্য তাহাকে কখনই তিরস্কার করিবে না, বরং সর্বদায় সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবে। বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে যেমন একটা সমান সমান ভাব থাকে, সেইরূপ সখ্য-প্রেমের সাধক ও তাঁহার সখারূপ ভগবানের মধ্যে একটা সমভাবের আদান প্রদান চলিতে থাকে। সুতরাং ভগবান্ আমাদের হৃদয়ের অতি সন্নিহিত বন্ধু হইলেন—সেই বন্ধুর নিকট আমরা আমাদের জীবনের সব কথা খুলিয়া বলিতে পারি, আমাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশের গুপ্তভাবগুলি তাঁহার নিকট জানাইতে পারি। সম্পূর্ণ ভরসা আছে যে, তিনি যাহাতে আমাদের মঙ্গল হয়, তাহাই করিবেন। এই ভাবিয়া আমরা একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এ-অবস্থায় ভক্ত ভগবানকে তাঁহার সমান মনে করেন। ভগবান্ যেন আমাদের খেলার সাথী, আমরা সকলে যেন এই জগতে খেলা করিতেছি। ছেলেরা যেমন খেলা করে, যেমন মহামহিমান্বিত রাজামহারাজাগণও যেমন নিজ নিজ খেলা খেলিয়া যান, সেইরূপ প্রেমময় ভগবান্ও নিজ জগতের সহিত খেলা করিতেছেন। তিনি পূর্ণ, তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। তাঁহার সৃষ্টি করিবার প্রযোজন কি? আমরা কার্য করি, তাহার উদ্দেশ্য কোন অভাবপূরণ, আর অভাব বলিতেই অসম্পূর্ণতা বুঝায়। ভগবান্ পূর্ণ, তাঁহার কোন অভাব নাই। কেন তিনি এই নিয়ত কর্মময় সৃষ্টি লইয়া ব্যস্ত থাকেন? তাঁহার উদ্দেশ্য কি? ভগবানের সৃষ্টির উদ্দেশ্য-বিষয়ে আমরা যে-সকল উপন্যাস কল্পনা করি, সেগুলি গল্প-হিসাবে সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু ঐগুলির অন্য কোন মূল্য নাই। বাস্তবিক সবই তাঁহার লীলা বা খেলা। এই জগৎ তাঁহার খেলা—ক্রমাগত এই খেলা চলিতেছে। তাঁহার পক্ষে সমুদয় জগৎ নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত একটি মজার খেলামাত্র। যদি তুমি দরিদ্র হও, তবে দারিদ্র্যকেই একটি কৌতুক বলিয়া উপভোগ কর; যদি ধনী হও, তবে ঐ অবস্থাও আর একটি তামাশারূপে সম্ভোগ কর। বিপদ আসে তো বেশ মজা, আবার সুখ আসিলে মনে করিতে হইবে, এ আরও মজা। সংসার একটি ক্রীড়াক্ষেত্র—আমরা এখানে বেশ নানারূপ কৌতুক উপভোগ করিতেছি—যেন খেলা হইতেছে, আর ভগবান্ আমাদের সহিত সর্বদাই খেলা করিতেছেন, আমরাও

তাঁহার সহিত খেলিতেছি। ভগবান্ আমাদের অনন্তকালের খেলার সাথী, কেমন সুন্দর খেলা খেলিতেছেন! খেলা সাঙ্গ হইল—এক যুগ শেষ হইল। তারপর অল্পাধিক সময়ের জন্য বিশ্রাম—তারপর আবার খেলা আরম্ভ—আবার জগতের সৃষ্টি! যখন ভুলিয়া যাও সবই খেলা, আর তুমিও এ-খেলার সহায়ক, তখনই—কেবল তখনই দুঃখকষ্ট আসিয়া উপস্থিত হয়; তখনই হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়, আর সংসার তোমার উপর প্রচণ্ড শক্তিতে চাপিয়া বসে। কিন্তু যখনই তুমি এই দু-দণ্ড জীবনের পরিবর্তনশীল ঘটনাবলীতে সত্যবুদ্ধি ত্যাগ কর, আর যখন সংসারকে লীলাভূমি ও নিজদিগকে তাঁহার লীলাসহায়ক বলিয়া মনে কর, তখনই তোমার দুঃখ চলিয়া যাইবে। প্রতি অণুতে তিনি খেলা করিতেছেন। তিনি খেলা করিতে করিতে পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি নির্মাণ করিতেছেন। তিনি মনুষ্যহৃদয়, প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌সমূহের সহিত খেলা করিতেছেন। আমরা যেন তাঁহার হাতে দাবাবোড়ের ঘুঁটি, একটি ছকে বসাইয়া তিনি যেন সেগুলি চালিতেছেন। তিনি আমাদিগকে প্রথমে একদিকে, পরে অপরদিকে সাজাইতেছেন—আমরাও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহারই খেলার সহায়ক। কি আনন্দ! আমরা তাঁহার খেলার সহায়ক।

পরবর্তী ভাবকে ‘বাৎসল্য’ বলে। উহাতে ভগবানকে পিতা না ভাবিয়া সন্তান ভাবিতে হয়। এটি কিছু নূতন রকমের বোধ হইতে পারে, কিন্তু উহার উদ্দেশ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হইতে ঐশ্বর্যের ভাবগুলি দূর করা। ঐশ্বর্য-ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ভয় আসে। ভালবাসায় কিন্তু ভয় থাকা ঠিক নয়। চরিত্র-গঠনের জন্য ভক্তি ও আজ্ঞাবহতা অভ্যাস করা আবশ্যক বটে, কিন্তু একবার চরিত্র গঠিত হইয়া গেলে প্রেমিক যখন শান্ত-প্রেমের একটু আস্বাদ পান, আবার প্রেমের তীব্র উন্মত্ততাও কিছু আস্বাদ করেন, তখন তাঁহার আর নীতিশাস্ত্র, বিধিনিয়ম প্রভৃতির কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না। ভক্ত বলেন, আমি ভগবানকে মহামহিম, ঐশ্বর্যশালী, জগদীশ্বর দেবদেবরূপে ভাবিতে চাই না। ভগবানের ধারণা হইতে এই ভয়োৎপাদক ঐশ্বর্যভাব দূর করিবার জন্য তিনি ভগবানকে নিজ শিশুসন্তান-রূপে ভালবাসেন। মাতাপিতা সন্তানকে ভয় করেন না, তাহার প্রতি তাঁহাদের ভক্তিও হয় না। সন্তানের কাছে তাঁহাদের প্রার্থনা করিবারও কিছু থাকে না। সন্তান সর্বদাই গ্রহীতা, সন্তানের প্রতি ভালবাসার জন্য মাতাপিতা শত শতবার শরীর ত্যাগ করিতে প্রস্তুত।

তাঁহাদের একটি সন্তানের জন্য তাঁহারা সহস্র জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। এই ভাব হইতে ভগবানকে বাৎসল্যভাবে ভালবাসা হয়। যে-সকল ধর্মসম্প্রদায় বিশ্বাস করেন, ভগবান্ নরদেহে অবতীর্ণ হন, তাঁহাদের মধ্যেই এই বাৎসল্যভাবে উপাসনা স্বাভাবিক। মুসলমানদের পক্ষে ভগবানকে বাৎসল্যভাবে উপাসনা করা অসম্ভব, তাঁহারা ভয়ে এ-ভাব হইতে দূরে সরিয়া যাইবেন। কিন্তু খ্রীষ্টান ও হিন্দু সহজেই ইহা বুঝিতে পারেন, কারণ তাঁহাদের মাতৃক্রোড়ে যীশু ও কৃষ্ণের শিশুমূর্তি রহিয়াছে। ভারতীয় নারীগণ অনেক সময় নিজদিগকে শ্রীকৃষ্ণের মাতা বলিয়া চিন্তা করেন; খ্রীষ্টান জননীগণও নিজদিগকে খ্রীষ্টের মাতা বলিয়া চিন্তা করিতে পারেন। ইহা হইতে পাশ্চাত্যের লোকেরা ঈশ্বরের মাতৃভাব সম্বন্ধেও জানিতে পারিবেন; আর ইহা তাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজন। ভগবানের প্রতি ভয়ভক্তিরূপ কুসংস্কার আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে দৃঢ়মূল হইয়া আছে। এই ভয়মিশ্রিত ভক্তি, ঐশ্বর্য ও মহিমার ভাব প্রেমে একেবারে নিমজ্জিত করিয়া দিতে অনেক দিন লাগে।

মানবীয় ভাবের আর একটি রূপে ভগবৎ-প্রেমের আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে, উহার নাম ‘মধুর’-ভাব, সর্বপ্রকার ভাবের মধ্যে উহাই শ্রেষ্ঠ। এ- সংসারে প্রকাশিত সর্বোচ্চ প্রেমের উপর উহার ভিত্তি—আর মানবীয় অভিজ্ঞতায় যত প্রকার প্রেম আছে, তাহার মধ্যে উহাই উচ্চতম ও প্রবলতম। স্ত্রী-পুরুষের প্রেম যেরূপ মানুষের সমুদয় প্রকৃতিকে ওলট-পালট করিয়া দেয়, আর কোন্ প্রেম সেরূপ করিতে পারে? কোন্ প্রেম মানুষের প্রতিটি পরমাণুর মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে পাগল করিয়া তুলে?—তাহার নিজের প্রকৃতি ভুলাইয়া দেয়?—মানুষকে হয় দেবতা, নয় পশু করিয়া ফেলে? দিব্য প্রেমের এই মধুরভাবে ভগবান্ আমাদের পতি। আমরা সকলে স্ত্রী বা প্রকৃতি, জগতে পুরুষ আর কেহ নাই। একমাত্র পুরুষ আছেন—তিনিই, আমাদের সেই প্রেমাস্পদই একমাত্র পুরুষ। পুরুষ নারীকে এবং নারী পুরুষকে যে ভালবাসা দিয়া থাকে, সেই ভালবাসা ভগবানকে অর্পণ করিতে হইবে।

আমরা জগতে যত প্রকার প্রেম দেখিতে পাই, যাহা লইয়া আমরা অল্পাধিক পরিমাণে খেলাই করিতেছি, ভগবান্ই সেগুলির একমাত্র লক্ষ্য। তবে দুঃখের বিষয়, যে অনন্ত

সমুদ্রে এই প্রেমের প্রবল স্রোতস্বতী অবিরতভাবে প্রবাহিত হইতেছে, মানব তাহা জানে না; সুতরাং নির্বোধের ন্যায় সে মানুষরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুতুলের প্রতি উহা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করে। মানব-প্রকৃতিতে সন্তানের প্রতি যে প্রবল স্নেহ দেখা যায়, তাহা কেবল একটি সন্তানরূপ ক্ষুদ্র পুতুলের জন্য নয়; যদি তুমি অন্ধভাবে ঐ একটিমাত্র সন্তানের উপরই উহা প্রয়োগ কর, তবে সেজন্য তোমাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে। কিন্তু ঐ কষ্টবোধ হইতেই তোমার এই বোধ আসিবে, তোমার ভিতর যে-প্রেম আছে, তাহা যদি কোন মনুষ্যে প্রয়োগ কর, তবে শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, মনে দুঃখ ও বেদনা পাইবে। অতএব আমাদের প্রেম সেই পুরুষোত্তমকেই দিতে হইবে—যাঁহার বিনাশ নাই, যাঁহার কখনও কোন পরিবর্তন নাই, যাঁহার প্রেমসমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটা নাই। প্রেম যেন তাঁহার প্রকৃত লক্ষ্যে উপনীত হয়, যেন উহা ভগবানের নিকট পৌঁছায়—যিনি প্রকৃতপক্ষে প্রেমের অনন্ত সমুদ্রস্বরূপ, প্রেম যেন তাঁহারই নিকট পৌঁছায়। সকল নদীই সমুদ্রে গিয়া পড়ে, একটি জলবিন্দুও পর্বতগাত্র হইতে পতিত হইয়া নদীতে থামিতে পারে না, ঐ নদী যত বড়ই হউক না কেন! অবশেষে সেই জলবিন্দু কোন না কোনরূপে সমুদ্রে যাইবার পথ করিয়া লয়। ভগবান্‌ই আমাদের সর্বপ্রকার ভাবাবেগের একমাত্র লক্ষ্য। যদি রাগ করিতে চাও, ভগবানের উপর রাগ কর। তোমার প্রেমাস্পদকে তিরস্কার কর, বন্ধুকে ভর্ৎসনা কর; আর কাহাকে তুমি নির্ভয়ে তিরস্কার করিতে পার? মর্ত্য-জীব তোমার রাগ সহ্য করিবে না; প্রতিক্রিয়া আসিবেই। যদি তুমি আমার উপর ক্রুদ্ধ হও, আমিও অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে তোমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিব, কারণ আমি তোমার ক্রোধ সহ্য করিতে পারিব না। তোমার প্রেমাস্পদকে বলো, 'তুমি আমার কাছে কেন আসিতেছ না? কেন তুমি আমাকে এভাবে একা ফেলিয়া রাখিয়াছ?' ভগবান্ ছাড়া আর কিসে আনন্দ আছে? ছোট ছোট মাটির টিপিতে আর কি সুখ? অনন্ত আনন্দের ঘনীভূত ভাবকেই অন্বেষণ করিতে হইবে—ভগবান্‌ই এই আনন্দের ঘনীভূত ভাব। আমাদের সকল ভাবাবেগ যেন তাঁহারই সমীপে উন্নীত হয়। ঐগুলি তাহারই জন্য অভিপ্রেত; লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে ঐগুলি নীচভাবে পরিণত হয়; সোজা লক্ষ্যস্থলে অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিলে অতি নিম্নতম বৃত্তি পর্যন্ত রূপান্তরিত হয়। মানুষের শরীর ও মনের সমুদয় শক্তি যেভাবেই প্রকাশিত হউক না কেন, ভগবান্‌ই

উহাদের একমাত্র লক্ষ্য—'একায়ন'। মনুষ্যহৃদয়ের সব ভালবাসা—সব প্রবৃত্তি যেন ভগবানের দিকেই যায়; তিনিই একমাত্র প্রেমাস্পদ। এই হৃদয় আর কাহাকে ভালবাসিবে? তিনিই পরম সুন্দর, পরম মহীয়ান—সৌন্দর্যস্বরূপ, মহত্ত্বস্বরূপ। তাঁহা অপেক্ষা সুন্দর জগতে আর কে আছে? তিনি ব্যতীত স্বামী হইবার উপযুক্ত জগতে আর কে আছে? জগতে ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র আর কে আছে? অতএব তিনিই যেন আমাদের স্বামী হন, তিনিই যেন আমাদের প্রেমাস্পদ হন।

অনেক সময় দেখা যায়, দিব্যপ্রেমে মাতোয়ারা ভক্তগণ এই ভগবৎপ্রেম বর্ণনা করিতে গিয়া সর্বপ্রকার মানবীয় প্রেমের ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকেন, উহাকেই যথেষ্ট উপযোগী মনে করেন। মূর্খেরা ইহা বুঝে না—তাহারা কখনও ইহা বুঝিবে না। তাহারা উহা কেবল জড়দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। তাহারা এই আধ্যাত্মিক প্রেমোন্মত্ততা বুঝিতে পারে না। কেমন করিয়া বুঝিবে? 'হে প্রিয়তম, তোমার অধরের একটিমাত্র চুম্বন! যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ, তোমার জন্য তাহার পিপাসা বর্ধিত হইয়া থাকে। তাহার সকল দুঃখ চলিয়া যায়। সে তোমা ব্যতীত আর সব ভুলিয়া যায়।'১৫ প্রিয়তমের সেই চুম্বন—তাঁহার অধরের সহিত সেই স্পর্শের জন্য ব্যাকুল হও—যাহা ভক্তকে পাগল করিয়া দেয়, যাহা মানুষকে দেবতা করিয়া তুলে। ভগবান্ যাঁহাকে একবার তাঁহার অধরামৃত দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, তাঁহার সমুদয় প্রকৃতিই পরিবর্তিত হইয়া যায়। তাঁহার পক্ষে জগৎ অন্তর্হিত হয়—তাঁহার পক্ষে সূর্য-চন্দ্রের আর অস্তিত্ব থাকে না, সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চই সেই এক অনন্ত প্রেমের সমুদ্রে বিগলিত হইয়া যায়। ইহাই প্রেমোন্মত্ততার চরম অবস্থা।

প্রকৃত ভগবৎ-প্রেমিক আবার ইহাতেও সন্তুষ্ট নন। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমও তাঁহার নিকট তত উন্মাদক নয়। ভক্তেরা অবৈধ (পরকীয়) প্রেমের ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন, কারণ উহা অতিশয় প্রবল। উহার অবৈধতা তাঁহাদের লক্ষ্য নয়। এই প্রেমের প্রকৃতি এই যে, যতই উহা বাধা পায়, ততই উগ্রভাব ধারণ করে। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা সহজ স্বচ্ছন্দ—উহাতে কোন বাধাবিঘ্ন নাই। সেই জন্য ভক্তেরা কল্পনা করেন, যেন কোন নারী তাঁহার প্রিয়তম পুরুষে আসক্ত, এবং তাঁহার পিতা, মাতা বা স্বামী ঐ প্রেমের বিরোধী। যতই ঐ প্রেম

বাধাপ্রাপ্ত হয়, ততই উহা প্রবল ভাব ধারণ করিতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে কিরূপ লীলা করিতেন, কিরূপে সকলে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে ভালবাসিত, কিরূপে তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র গোপীরা—সেই ভাগ্যবতী গোপীরা সবকিছু ভুলিয়া—জগৎ ভুলিয়া, জগতের সকল বন্ধন, সাংসারিক কর্তব্য, সংসারের সুখদুঃখ ভুলিয়া—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, মানবীয় ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। মানুষ—মানুষ, তুমি ভগবৎ-প্রেমের কথা বলো, আবার জগতের সব অসার বিষয়ে নিযুক্ত থাকিতেও পার; তোমার কি মন মুখ এক? 'যেখানে রাম আছেন, সেখানে কাম থাকিতে পারে না। যেখানে কাম, সেখানে রাম থাকিতে পারেন না; এই দুইটি কখনও একত্র থাকে না। আলো এবং অন্ধকার (রবি ও রজনী) কখনও একসঙ্গে থাকে না।'

১০. উপসংহার

যখন প্রেমের এই উচ্চতম আদর্শে উপনীত হওয়া যায়, তখন দর্শনশাস্ত্র ফেলিয়া দিতে হয়, কে আর তখন ঐগুলির জন্য ব্যস্ত হইবে? মুক্তি, উদ্ধার, নির্বাণ—এ-সবই তখন কোথায় চলিয়া যায়! এই ঈশ্বর-প্রেম সম্ভোগ করিতে পাইলে কে মুক্ত হইতে চাই? 'ভগবান্, আমি ধন জন সৌন্দর্য বিদ্যা—এমন কি মুক্তি পর্যন্ত চাই না। জন্মে জন্মে তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।'১৭ ভক্ত বলেন, 'চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি।' তখন কে মুক্ত হইবার ইচ্ছা করিবে? কে ভগবানের সহিত এক হইয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা করিবে? ভক্ত বলেন, 'আমি জানি— তিনি ও আমি এক, তথাপি আমি তাঁহা হইতে নিজেকে পৃথক্ রাখিয়া প্রিয়তমকে সম্ভোগ করিব।'

প্রেমের জন্য প্রেম—ইহাই ভক্তের সর্বোচ্চ সুখ। প্রিয়তমকে সম্ভোগ করিবার জন্য কে না সহস্রবার বদ্ধ হইবে? কোন ভক্তই প্রেম ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করেন না; তিনি স্বয়ং ভালবাসিতে চান, আর চান ভগবান্ যেন তাঁহাকে ভালবাসেন। তাঁহার নিষ্কাম প্রেম—যেন উজান বাহিয়া যাওয়া। প্রেমিক যেন নদীর উৎপত্তিস্থানের দিকে—স্রোতের বিপরীত দিকে যান। জগৎ তাঁহাকে পাগল বলে। আমি একজনকে জানি, লোকে তাঁহাকে পাগল বলিত! তিনি উত্তর দিতেন, 'বন্ধুগণ, সমুদয় জগৎ তো একটা বাতুলালয়। কেহ সাংসারিক প্রেম লইয়া উন্মত্ত, কেহ নামের জন্য, কেহ যশের জন্য, কেহ অর্থের জন্য, আবার কেহ বা স্বর্গলাভের জন্য পাগল। এই বিরাট বাতুতালয়ে আমিও পাগল, আমি ভগবানের জন্য পাগল। তুমি টাকার জন্য পাগল, আমি ঈশ্বরের জন্য পাগল। তুমিও পাগল, আমিও পাগল। আমার বোধ হয়, শেষ পর্যন্ত আমার পাগলামিই সব চেয়ে ভাল।' প্রকৃত ভক্তের প্রেম এই প্রকার তীব্র উন্মত্ততা, উহার কাছে আর সব আকর্ষণই অন্তর্হিত হয়। সমুদয় জগৎ তাঁহার নিকট কেবল প্রেমে পূর্ণ—প্রেমিকের চক্ষে এইরূপই বোধ হয়।মানুষের হৃদয়ে যখন এই প্রেম আবির্ভূত হয়, তখন তিনি অনন্তকালের জন্য সুখী— চিরকালের জন্য মুক্ত

হইয়া যান। ভগবৎ-প্রেমের এই পবিত্র উন্মত্ততাই কেবল আমাদের সংসার-ব্যাধি চিরকালের জন্য আরোগ্য করিতে পারে।

দ্বৈতভাব লইয়াই আমাদিগকে প্রেমের ধর্ম আরম্ভ করিতে হয়। আমাদের মনে হয়, ভগবান্ আমাদের হইতে পৃথক্, আর আমরাও নিজদিগকে তাঁহা হইতে ভিন্ন বোধ করি। উভয়ের মধ্যে প্রেম আসিয়া মিলন সম্পাদন করে। তখন মানুষ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, আর ভগবান্ও ক্রমশঃ মানুষের নিকটতর হইতে থাকেন। মানুষ সংসারের সব সম্বন্ধ—যেমন পিতা, মাতা, পুত্র, সখা, প্রভু, প্রণয়ী প্রভৃতির ভাব লইয়া তাহার প্রেমের আদর্শ ভগবানের প্রতি আরোপ করিতে থাকে। তাহার নিকট ভগবানেই সর্বরূপে বিরাজিত। আর তখনই সাধক উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হন, যখন তিনি নিজ উপাস্য দেবতায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হইয়া যান। প্রথম অবস্থায় আমরা সকলেই নিজেকে ভালবাসি। এই ক্ষুদ্র অহং-এর অসঙ্গত দাবী ভালবাসাকেও স্বার্থপর করিয়া তুলে। অবশেষে কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ হয়, তখন দেখা যায়—এই ক্ষুদ্র 'অহং' সেই অনন্তের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে, মানুষ স্বয়ং এই প্রেমজ্যোতির সম্মুখে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়। পূর্বে অল্পাধিক পরিমাণে তাঁহার যে-সকল মলিনতা ও বাসনা ছিল, তখন সেগুলি সব চলিয়া যায়। অবশেষে তিনি এই সুন্দর প্রাণস্পর্শী সত্য অনুভব করেন—প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ একই।